আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) একটি বিশ্লেষণ

সেনা অভিযান : কিছু সাংবিধানিক ও আইনি প্রশ্ন

গত ১৭ অক্টোবর গভীর রাতে কোনোরকম পূর্বঘোষণা ছাড়া সারা দেশে সেনাবাহিনী নামানো হয়। 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' নামের এই অভিযানে ইতিমধ্যে কয়েক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেনা হেফাজতে নির্মম অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মারা গেছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সামরিক বাহিনীর এই নিয়োগ এবং কথিত অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি কতটা আইনানুগ এবং সমস্যার প্রকৃত সমাধানে এ ধরনের অভিযান কতখানি সহায়ক।

সন্ত্রাসী ধরার কাজে সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, দেশব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূলে এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে (১৯ অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠ)। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমেদকে উদ্ধৃত করে জনকণ্ঠ ১৯ অক্টোবর জানায়, মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে সাময়িকভাবে সেনা সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেনা অভিযানের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব ২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী নিয়োগের কিছু নজিরের কথা উল্লেখ করলেও এর পক্ষে কোনো আইনি বিধান উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন (২১ অক্টোবর প্রথম আলো)। তবে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ গত ১৮ অক্টোবর জানান, ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৯ ও ১৩০ ধারা অনুযায়ী সেনাবাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবে (১৯ অক্টোবর ইত্তেফাক)। উল্লেখ্য, ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৯ ও ১৩০ ধারা কেবল বেআইনি সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১২৯ ধারা অনুযায়ী বেআইনি সমাবেশ বা ক্ষুব্ধ হিংস্র জনতাকে যদি পুলিশ দিয়ে ছত্রভঙ্গ করা সম্ভব না হয়, তাহলে উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে পারেন। ১৩০ ধারা অনুযায়ী, আহূত সেনা অফিসার সমাবেশ ছত্রভঙ্গ, সমাবেশকারীদের গ্রেপ্তার ও আটক করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কম শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং যাতে সম্পত্তির সর্বনিম্ন পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে দায়িত্ব পালন করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এখন বেআইনি সমাবেশের সংজ্ঞা কী তা বুঝে নেওয়া দরকার। দণ্ডবিধি ১৪১ ধারায় প্রদত্ত বেআইনি সমাবেশের সংজ্ঞা অনুযায়ী–পাঁচ বা ততদিক ব্যক্তির সমাবেশ বেআইনি সমাবেশ বলে অভিহিত হবে যদি ওই সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিগণের সাধারণ উদ্দেশ্য এরূপ হয়– প্রথমত, অপরাধমূলক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো সরকারি কর্মচারীকে তার দায়িত্ব পালনে ভয়াভিভূত করা; দ্বিতীয়ত, কোনো আইন বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধা দান করা; তৃতীয়ত, কোনো দুষ্কর্ম বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্যবিধ অপরাধ অনুষ্ঠান করা; চতুর্থত, অপরাধমূলক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে আইনানুগ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং পঞ্চমত, অপরাধমূলক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে যা সম্পাদন করার জন্য সে আইনগত বাধ্য নয়, তা করতে বাধ্য করা বা যা সম্পাদন করার জন্য তার আইনানুগ অধিকার রয়েছে তা সম্পাদন হতে তাকে বিরত রাখা। কিন্তু অধিকাংশ গ্রেপ্তারকৃতকেই গভীর রাতে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। যেখানে বেআইনি সমাবেশের অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো অনুপস্থিত।

অপরাধ আইন বিজ্ঞানের মৌলিক নীতি হচ্ছে, সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়ার এই নীতির উদ্ভবে কাজ করেছে একটি প্রাচীন দর্শন, 'একজন নির্দোষীকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে দশজন দোষীকে মুক্তি দেওয়া শ্রেয়।' আমাদের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, 'আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যেকোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ,

সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।' আবার ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি প্রসঙ্গে কার্যবিধি সম্পর্কিত একটি রক্ষাকবচ বর্ণিত হয়েছে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের প্রথম এবং দ্বিতীয় দফায়। প্রথম দফা অনুযায়ী 'গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।' আবার দ্বিতীয় দফা অনুযায়ী 'গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।' একই রকম বিধান আছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৮১ ধারায়। আবার বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তি প্রসঙ্গে ৩৩(২) অনুচ্ছেদে দেওয়া অধিকারটির প্রযোজ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৬০ ও ৬১ ধারায়।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের নয়টি ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে (ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে ধারাটি এমনিতেই বেশ পরিচিত)। তবে উল্লেখ করার মতো প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র রয়েছে কেবল দুটি। কোনো আমলযোগ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি অথবা এরূপ জড়িত বলে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে এবং এই কার্যবিধি অনুসারে অথবা সরকারের আদেশ দ্বারা যাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে–এমন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যায়। তবে এ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে কেবল পুলিশ অফিসারের ওপর, যিনি আবার তার অধস্তন কর্মচারীকে এ ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন। যেখানে আইনমন্ত্রী দাবি করছেন যে সেনা সদস্যদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। (১৯ অক্টোবর, ইত্তেফাক), সেখানে সেনা সদস্যরা কোন আইনের আওতায় এবং কী ধরনের ক্ষমতা বলে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করছে তা বোধগম্য নয়। ২০ অক্টোবরের প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ১৪৪ জন তালিকা বহির্ভূত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের কথা স্বীকার করেছেন, পত্রিকা অনুযায়ী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ২৬৩ (২১ অক্টোবর প্রথম আলো)। বলা চলে চলতি সেনা অভিযানে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে দেওয়া এসব সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকারের কোনো তোয়াক্কাই করা হচ্ছে না।

যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের সৃষ্টি করছে তা হচ্ছে গ্রেপ্তারকালীন ও গ্রেপ্তার-পরবর্তী সময়ে সেনা সদস্যদের আচরণ। সেনা সদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃতদের চোখ বেঁধে বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার সচিত্র খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত সেনা সদস্যদের নির্যাতনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ এবং আহত হয়েছে অসংখ্য লোক। সেনা সদস্যদের ধমক এবং হকিস্টিকের আঘাতে সংজ্ঞা হারায় চট্টগ্রামের পুলিশ কনস্টেবল কালাচান ত্রিপুরা।

আমাদের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।' আবার দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ৩৩০ ও ৩৩১ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে অপরাধের স্বীকারোক্তি করাতে বা তার কাছ থেকে কোনো তথ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তি বা তার আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করা যাবে না। এরূপ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করা হলে তার শাস্তি সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড এবং আঘাতের প্রকৃতি গুরুতর হলে শাস্তির মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে স্পষ্টতই সেনাবাহিনীর এই অভিযানের ব্যাপারে সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন লংঘনের বিষয়টি এসে যায়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে নারায়ণগঞ্জ জেলায় এবং ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে বিডিআর বাহিনী পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে অসংখ্য ব্যক্তিকে আটক করে তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। সোয়ারীঘাটের মৎস্য ব্যবসায়ী সোহেল ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট আবেদন দাখিল করলে মাননীয় আদালত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিডিআরের মহাপরিচালকসহ অন্য তিনজন রেসপন্ডেন্টকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আটক, নির্যাতন এবং পরিবারকে হয়রানি করা কেন অসাংবিধানিক, অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন এবং যথাযথ

আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতিরেকে এই ধরনের গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও হয়রানি নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সবারই আইনানুগ ব্যবহার ও বিচার লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো বাহিনীই আইনশৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে নয়। রাজনীতিতে পেশিশক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করা এবং অপরাধচক্রের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের যোগসাজশ ও তাদের লাগামহীন দুর্নীতিই দেশের সংকটময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। কয়েকদিনের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ ও ব্যাপক ধরপাকড় এর সমাধান নয় বরং প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। আমরা আশা করব বিডিআর অভিযানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়া রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে অনতিবিলম্বে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সত্যিকার অর্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র : মানবাধিকার সংগঠন।

****